দৈনিক বাংলা
তারিখ 18 APR 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সময়ের দাবি এবং আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা

'সর্ব অঙ্গে ঘা, এখন মলম লাগাই কোথা?'–এমন সংকটেও হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। নিরাময় লাভের চেষ্টা কিছু করতেই হয়। শিক্ষার কোনো বিশেষ সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসলে গোড়ায় ওই পুরানো প্রবাদটিই মনে আসে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই যখন গভীর থেকে গভীরতর সংকটে তলিয়ে যাচ্ছে, সে সময়ও তাই বিশেষ দিক নিয়েও ভাবনা এড়ানো যায় না। যেমন মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার করুণ চিত্রও আমাদের আলাদা করে আলোড়িত করে।

শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা গত অর্ধশতকের, হদিস নিলে দেখা যাবে–বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত সম্প্রসারণের জোর তাগিদ এ গোটা সময় জুড়ে তো বটেই, হয়ত তার অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব হাতে নেয়ার পর সে তাগিদ বহুগুণ জোরদার হয়ে উঠেছে। এর পেছনে সময়েরও কিছু চাপ আছে। বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরাও আসন্ন নতুন শতকের প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার স্বার্থে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে বা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি।

কিন্তু এই বুঝতে পারা বা স্বীকার করার ফল কি দাঁড়িয়েছে? অস্বীকার করার উপায় নেই, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে আমরা যেমন কথা বলি, পাঠ্যসূচী বিন্যাসে, এমন কি শিক্ষায়তনের সুযোগ সৃষ্টিতেও অংশত, তার কিছু প্রতিফলন ঘটিয়েছি। পাঠক্রম নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নিম্নমাধ্যমিক থেকে আলাদাভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এসব কাগুজে কর্মকান্ড, আর আংশিকভাবে হলেও বাস্তব উদ্যোগ, সত্যি কি দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতে কোনো প্রসার ঘটাতে পেরেছে?

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটানোর তাগিদ যদি সত্য বা আন্তরিক হয়, এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই খুঁজতে হবে। মুখে আমরা যা বলি তার যৌক্তিকতা রক্ষার খাতিরে হলেও বাস্তব কাজ যেটুকু হয়েছে তার পেছনে কম সম্পদ আর শক্তি ব্যয়িত হয়নি। এ ব্যয়ের যৌক্তিকতা রক্ষার চেয়ে বড় কথা–মুখে হলেও যে প্রয়োজনের কথা আমরা বলি তার বাস্তবতা তো অস্বীকার করার নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার দক্ষতাই অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম শর্ত। বিশ্বজুড়ে যে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে অবশ্যই আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হবে। তলিয়ে দেখার তাগিদ এদিক থেকেও অনস্বীকার্য।

সম্প্রতি এ পত্রিকায় আটটি কিস্তিতে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে যে ছবি ফুটে উঠেছে তাকে হতাশ বা নৈরাশ্যজনক বললেও কিছুই বলা হয় না। হতাশার ছবি পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে এ প্রতিবেদনের সঙ্গে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করারও কোনো প্রয়োজন আছে মনে করি না। আমাদের তাই প্রতিকার নিয়ে ভাবতে হবে।

এর আগে পরিস্থিতির মোটামুটি একটা ছবি সামনে আনা দরকার। বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জাতীয় তাগিদ আর শিক্ষার্থী-অভিভাবকের তাগিদের বৈষম্য লক্ষণীয়। শিক্ষার্থী-অভিভাবক প্রধানত নির্ভরযোগ্য পেশাগত বিদ্যা অর্জনের তাড়নাতেই মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে থাকেন। এই পেশা নির্বাচনের সীমাও খুবই ক্ষুদ্র–প্রকৌশল আর চিকিৎসা।

এমনিতে এতে অস্বাভাবিকতা কিংবা আপত্তির কিছু নেই। একটি পশ্চাদপদ সমাজে পেশাগত নিরাপত্তার বিবেচনা দোষের কিছু না। আপত্তি আসে এ পর্যায়ে যে, মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষাকে বিশেষ লক্ষ্যাভিসারি করে তোলার ফলে শিক্ষায় খামতি ঘটে। আর জনবহুল দেশের সকল বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রকৌশলী কিংবা চিকিৎসক হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বাঞ্ছিতও না। সম্ভব নয় বলেই সকলের প্রত্যাশা মেটে না। ফলে এদের বৃহত্তর অংশের জন্যেই বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। হতাশায় নিমজ্জিত অনেকের শিক্ষা জীবনই পরিণত হয় বিড়ম্বনায়।

সমস্যার এ দিকটির চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে গোটা আয়োজনের দৈন্য। বিদ্যালয় থেকে কলেজ সর্বত্রই বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ এবং অন্যবিধ আয়োজনের ঘাটতি সব কিছুকে অর্থহীন করে তুলেছে। ক্লাস থাকলে শিক্ষক নেই, শিক্ষক থাকলে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ নেই। সেই সঙ্গে নেই শিক্ষাদানের যুগোপযোগী প্রস্তুতি। ফলে বই মুখস্ত করে পাশের নম্বর সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে ওঠা কিছুতেই হয় না।

নিম্ন আর উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের হার সামনে নিলেই বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যর্থতার অবয়ব অনুধাবনে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। গত বছর কুমিল্লা বোর্ড থেকে চল্লিশ হাজারের কিছু বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখায় এসএসসি পাস করে। এদের মাঝ থেকে মাত্র সাড়ে বারো হাজারের মত উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়। এমন হার প্রতিটি বোর্ডের জন্যেই সত্য।

এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে, বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগের অন্তত দুই তৃতীয়াংশই ব্যর্থ। এসএসসি'র পর সকলেই আর এইচএসসি পড়তে আসে না বা আসতে পারে না, এ সত্য মানলেও কম করে দুই-তৃতীয়াংশের বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যর্থ মানতে অসুবিধে নেই। কেননা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছাত্রেরাই পড়তে আসে। সাধারণভাবে উচ্চ মাধ্যমিকে ওদের বাদ পড়ার কথা নয়।

এসএসসি পর্যায়ের পর বিজ্ঞান ছেড়ে দেয়াকে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যর্থতা বলার আরো কারণ আছে। কেননা এ পর্যায়ে বিষয় বদলের ফলে শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় অনস্বীকার্য। অন্যদিকে বিদ্যালয় পর্যায়ে এমন কিছু বিজ্ঞান শিক্ষা আমরা দিই না বা দিতে পারি না যে, এর কোনো ব্যবহারিক মূল্য দাঁড়াতে পারে।

এই ব্যর্থতার উৎস খুঁজতে গেলেও দেখা যাবে সেই শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিই সার কথা। আর এই ত্রুটিই যদি সারিয়ে তোরা না যায়, তাগিদ যত জরুরীই হোক, বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত প্রসারের আশা করা যায় কি?

ফিরে আসি যোগ পরিবর্তনের প্রসঙ্গে। বঙ্গাব্দের হিসেবে আমরা একটি শতক শেষ করতে বসেছি। তারচে বড় কথা বহুল প্রচলিত খৃষ্টীয় বিশ শতক শেষ হয়ে একুশ শতক অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে। এই নতুন শতকে উত্তরণের ব্যাপারটা আদতেই ভাববার বিষয়।

এমনিতে বলা হতে পারে সময়ের ভাগ-বাটোয়ারা এই বছর-শতক সবই তো কল্পনার ব্যাপার। এর তো কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এ নিয়ে তাই মাথা ঘামানোর কি আছে? অবশ্যই আছে। সময়ের পরিমাপটা কল্পনা হলেও এর পরিধিতে জীবন চর্চায় যে পরিবর্তন আসে তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য। বিশ আর একুশ শতকের মধ্যবর্তী পরিবর্তন ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যবহ। বিশ শতকের বিজ্ঞান সাধনা একুশ শতককে একান্তই এক উন্নত প্রযুক্তির যুগে বিশেষায়িত করতে চলেছে। যেখানে মান্ধাতার আমলের শিক্ষা আর দক্ষতা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেও অপর্যাপ্ত প্রমাণ হতে বাধ্য। অপেক্ষাকৃত উন্নত বিশ্বও আজ তাই নিজেদের বিজ্ঞান শিক্ষাকে যুগের উপযোগী করে তোলায় উঠেপড়ে লেগেছে। এমনিতেই যারা পিছিয়ে আছি তাদের সংকট তাই তীব্রতর।

এ অবস্থায় করণীয় একটাই, দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তার বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একটা ঘোষণা করে দেয়া কঠিন কিছু না। সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়নেই যত সমস্যা। তবে সিদ্ধান্ত যদি দৃঢ় আর আন্তরিক হয়, বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ পড়ে তোলাও অসম্ভব থাকবে না। যেসব সীমিত লক্ষ্য নিয়ে আজকের শিক্ষার্থী আর অভিভাবক বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী হন, তার প্রসার আপনা থেকেই ঘটবে। প্রয়োজন কেবল পরিবেশ গড়ে তোলা। প্রয়োজন নিয়ে চেতনা নেই এমন না, চেতনাটাকে আরো কিছু স্পষ্ট করে তুলে ধরাই বাকি। সমাজের নেতৃত্ব আর কল্যাণকামী সকলকেই এ দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে নিতে হবে।

— সালেহ চৌধুরী